HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা
বর্ষ ৯ • সংখ্যা ২ • জুন ২০১১
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

অন্যান্য পাতায়

পৃষ্ঠা ৫
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অল্প-বয়সী শিশুদের মধ্যে এইচ৫এন১ এবং এইচ৯এন২ সংক্রমণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের মৃদু সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব

পৃষ্ঠা ১৩
লালমনিরহাট জেলায় নিপাহ এনসেফালাইটিসের প্রাদুর্ভাব, ২০১১

পৃষ্ঠা ১৯
সার্ভিলেন্স আপডেট

মাতৃমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যসেবা জরিপ ২০১০

বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় মাতৃমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যসেবা জরিপ পরিচালিত হয় ২০১০ সালে। গত নয় বছরে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুহার ৪০% কমেছে। এখন প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্ম দিতে গিয়ে ১৯৪ জন মা মারা যান। এই হার কমার পিছনে সম্ভাব্য যেসব বিষয় কাজ করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রজনন ক্ষমতা (ফার্টিলিটি) হ্রাসের প্রভাব যার ফলে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জন্মের হার কমে যায়। এছাড়া, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে প্রসব করানো ও মাতৃত্বজনিত জটিলতায় চিকিৎসাসেবা নেওয়ার হার বেড়ে যাওয়ার ফলেও এ-হার কমেছে বলে মনে হয়। বাংলাদেশ ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুহার চারভাগের তিনভাগ কমিয়ে এনে শহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৫ (এমডিজি-৫) অর্জনের জন্য সঠিক পথে আছে বলে মনে হয়, তবে লক্ষে পৌঁছানোর জন্য উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় মাতৃমৃত্যু এবং স্বাস্থ্যসেবা জরিপ পরিচালিত হয় ২০১০ সালে। জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ২০০৮-২০১০ সালের মাতৃমৃত্যুর হার নির্ণয় করা, যার মাধ্যমে ১৯৯৮-২০০১ সালে পরিচালিত জরিপের (১) পর মাতৃমৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে কি না তা জানা এবং মাতৃমৃত্যুর কারণসমূহ সনাক্ত করা যায়। ২০১০ সালের জরিপের প্রধান প্রধান ফলাফলের ওপর তৈরি সারসংক্ষেপের ওপর ভিত্তি করে আলোচ্য প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

এ জরিপে জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল ১৭৫,০০০টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাঠকর্মীরা ১৩-৪৯ বছর-বয়সী বিবাহিত মহিলাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং প্রজননক্ষম কোনো মহিলার, বিশেষ

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

করে মাতৃত্ব এবং প্রসবজনিত কারণে, মৃত্যু হয়েছে কি না তা অনুসন্ধান করেন। মহিলারা গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা নিয়েছেন কি না, কতজন অভিজ্ঞ ধাত্রী দ্বারা প্রসব করিয়েছেন এবং গর্ভ-সংক্রান্ত জটিলতার ক্ষেত্রে কেউ সেবা গ্রহণ করেছেন কি না সে সম্পর্কিত তথ্যাবলিও সংগ্রহ করা হয়। ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত মাঠকর্মীরা জরিপের উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা প্রত্যেক খানায় জিজ্ঞেস করেন যে, ২০০৭ সাল থেকে তাদের খানায় কেউ মারা গেছেন কি না। কেউ মারা গিয়ে থাকলে মৃতব্যক্তির নাম, লিংগ এবং মৃত্যুকালে তার বয়স কত ছিলো তা লিপিবদ্ধ করেন। তের থেকে ৪৯ বছর-বয়সী কোনো মহিলা মারা গিয়ে থাকলে মৃত্যুর সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন কি না, সন্তান প্রসবের সময় মারা গেছেন কি না, বা সন্তান প্রসব বা গর্ভ-সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার ফলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে মারা গেছেন কি না, ইত্যাদি সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা ভারবাল অটোপসি ফর্মের মাধ্যমে ১৩-৪৯ বছর-বয়সী মারা যাওয়া সব মহিলার তথ্য সংগ্রহ করেন। কমপক্ষে দুজন চিকিৎসক ইন্টারন্যশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজেজ, ভার্সন-১০ (আইসিডি-১০) এর সাহায্যে ভারবাল অটোপসির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে মৃত্যুর কারণসমূহ চিহ্নিত করেন। ২০০১ সালে প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে ৩২২ জন মা মারা যেতেন, যা ২০১০ সালে কমে ১৯৪ জনে এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ গত নয় বছরে এ-হার ৪০% কমেছে। ১৯৯০-২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি-৫ অর্জনের জন্য যেখানে এই হার চারভাগের তিনভাগ কমিয়ে গড়ে বছরে ৫.৪% কমানো প্রয়োজন, সেখানে এ সময়ে কমার হার ছিলো গড়ে বছরে ৫.৫%। দুটি জরিপের মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় সব-বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রেই মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে। মাতৃমৃত্যুর এই হার কমার পুরোটাই ঘটেছে গর্ভ ও প্রসব-সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ কারণে মৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ফলে। গর্ভকালীন এবং প্রসবের সময় মাতৃমৃত্যুহার কমেছে ৫০%, এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে মৃত্যুহার কমেছে ৩৪%। গর্ভ-সংক্রান্ত মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ হলো, রক্তক্ষরণ (৩১%), একলামশিয়া (২০%), জটিল বা দীর্ঘস্থায়ী প্রসব বেদনা (৭%) এবং গর্ভপাত (১%)। ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে রক্তক্ষরণের জন্য মাতৃমৃত্যুহার কমেছে ৩৫%, একলামশিয়ার কারণে কমেছে ৫০% এবং জটিল প্রসব-বেদনার কারণে কমেছে ২৬%।

অভিজ্ঞ ধাত্রীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার ২০০১ সালে ছিলো ১২.২%; ২০১০ সালে তা বেড়ে ২৬.৫% হয়েছে। এখনো খুবই কম সংখ্যক মহিলা (৪.৩%) প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীদের মাধ্যমে বাড়িতে সন্তান প্রসব করান এবং ২০০১ সাল থেকে এ-সংখ্যায় (৩.৫%) খুব সামান্য পরিবর্তন এসেছে। তবে সেবাকেন্দ্রে গিয়ে প্রসব করানো মহিলার হার ২০০১ সালের (৯%) তুলনায় ২০১০ সালে (২৩%) বেড়েছে। এই বৃদ্ধির অধিকাংশই ঘটেছে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে (২.৭% থেকে ১১.৩%), অবশ্য সরকারি খাতের সেবা গ্রহণকারীদের সংখ্যাও বেড়েছে (৫.৮% থেকে ১০.০%)। ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে (২.৬% থেকে ১২.২% – বছরে ৪৩৬,০০০ জন)। মাধ্যমিক পর্যায়ের বা তার থেকে বেশি শিক্ষিত মহিলাদের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসব করেছেন। সবচেয়ে বেশি ধনী শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসব করানোর প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায় (৩২%), যদিও সবচেয়ে গরীব শ্রেণীর মধ্যেও অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসবের হার বেড়ে ০.৫% থেকে ২.৭% হয়েছে। গর্ভ-সংক্রান্ত কোনো ধরনের জটিলতার কথা বলেন নি এমন মহিলাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসব করেছেন।

গর্ভ-সংক্রান্ত জটিলতা ছিলো এমন মহিলাদের মধ্যে কোনো ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনাসহ চিকিৎসাসেবা নেওয়ার হার ২০০১ সালের (৫৩%) জরিপের তুলনায় ২০১০ সালে (৬৮%) বেশি ছিলো। ২০০১ সালের (১৬%) তুলনায় ২০১০ সালে (২৯%) গর্ভ-সংক্রান্ত জটিলতা ছিলো এমন মহিলাদের কোনো সেবাকেন্দ্র থেকে সেবা নেওয়ার হার আরো বেশি পাওয়া গেছে। এমনকি অশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও জটিলতার জন্য সেবাকেন্দ্র থেকে সেবা নেওয়ার হার ২০০১ সালের (৮.৬%) তুলনায় ২০১০ সালে (১৬.৯%) দ্বিগুণ হয়েছে।

২০১০ সালের জরিপে মায়েদেরকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি শিক্ষিত দেখা গেছে, যা সর্বোপরি বাংলাদেশের নারী শিক্ষার, বিশেষ করে অল্প-বয়সী মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির নির্দেশনা দেয়। এই জরিপে অশিক্ষিত মহিলাদের হার ২০০১ সাল থেকে অর্ধেকে নেমে এসেছে (৪৫% থেকে ২৩%), এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের বা তার থেকে বেশি শিক্ষিত মহিলাদের হার দ্বিগুণ হয়েছে (২৬% থেকে ৪৫%)।

যদিও ধনী শ্রেণীর মধ্যে নিয়মিতভাবে সেবা নেওয়ার হার অনেক বেড়েছে, তবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সবগুলো নির্দেশক, যেমন, সেবাকেন্দ্রে প্রসবের সংখ্যা তিনগুণ (২০০১ সালে ২.৫% থেকে ২০১০ সালে ৭.৫%) বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষিত সহকারীর সাহায্যে প্রসব করা (৩.৬% থেকে ৯.২%) ও জটিলতার ক্ষেত্রে সেবা নেওয়ার হার বৃদ্ধি (৬.৭% থেকে ১৪.৫%) থেকে বোঝা যায় যে, সবচেয়ে গরীব শ্রেণীর মধ্যেও সেবা গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য কিছুটা কমেছে।

প্রতিবেদন: মেজার ইভালুয়েশন, জাতীয় জনসংখ্যা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং আইসিডিডিআর,বি।

অর্থানুকূল্য: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (অসএআইডি) এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), বাংলাদেশ।

মন্তব্য

বাংলাদেশে বিগত দশকে মাতৃমৃত্যুর হার কমে যাওয়া জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের সাফল্য। এ-হার কমার পিছনে একাধিক বিষয় কাজ করেছে। জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ গর্ভ ও প্রসব-সংক্রান্ত রক্তক্ষরণ এবং একলামশিয়ার ক্ষেত্রে মাকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা দরকার। রক্তক্ষরণ (৩১%) এবং একলামশিয়ায় (২০%) মৃতের হার কমে যাওয়ায়, সেবাকেন্দ্রে অভিজ্ঞ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসব করানোর হার বৃদ্ধি পাওয়ায়, এবং জটিলতার ক্ষেত্রে সেবাকেন্দ্রে গিয়ে সেবা নেওয়ার হার বেড়ে যাওয়া থেকে বোঝা যায় যে, যেসব মহিলার জরুরী সেবা নেওয়ার প্রয়োজন ছিলো, নয় বছর পূর্বের তুলনায় ২০০৮-২০০৯ সালের মধ্যে তাঁরা অধিক হারে সেবাকেন্দ্রে গিয়ে সেবা গ্রহণ করেছেন। যেহেতু অভিজ্ঞ ধাত্রী/সহকারীর সাহায্যে প্রসব করানোর হার বৃদ্ধির পুরোটাই সেবাকেন্দ্রভিত্তিক, সেহেতু সেবাকেন্দ্রসমূহে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে অনেক দ্রুত এবং বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে সেবা নেওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং নারী শিক্ষার উন্নতি সম্ভবত সেবা নেওয়ার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। তবে অশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও সেবা নেওয়ার বাড়তি হার দেখে মনে হয়, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেবার সহজলভ্যতাও

এক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। সরকার জরুরী প্রসূতি সেবার পরিধি উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত করেছে। ২০০১ সালে শুধুমাত্র তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জরুরী প্রসূতিসেবা পাওয়া যেতো, কিন্তু ২০১০ সালের মধ্যে ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই সেবা পাওয়া যায়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভবত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে মায়েদের (যাঁদের সেবা নেওয়ার প্রয়োজন) যোগাযোগের উন্নতি ঘটিয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ফলেও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে মহিলাদের সেবা নেওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাত থেকে সেবা নেওয়ার হার বেড়েছে, তবে গর্ভ-সংক্রান্ত কোনো ধরনের জটিলতা না থাকা মহিলাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসব করা থেকে বোঝা যায় যে, প্রসূতি-সংক্রান্ত বাড়তি কিছু ব্যবস্থা মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করছে না।

গত ১০ বছরে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, যা উন্নত বাসস্থান এবং বিদ্যুতের ব্যবহারের বৃদ্ধি এবং জরুরী স্বাস্থ্যসেবা খাতে অধিকতর অর্থ যোগান দেওয়ার সামর্থ দেখে বোঝা যায়। বাংলাদেশের এমডিজি-৫ অর্জনের লক্ষে পৌঁছাতে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার আরো ২৫% কমানো প্রয়োজন এবং তার জন্য উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখা গুরুত্বপূর্ণ। যেসব কৌশল সবচেয়ে বেশি কার্যকর বলে বিবেচিত হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে ফার্টিলিটি (প্রজনন ক্ষমতা) আরো কমানো, যা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মায়েদের সন্তান প্রসব ব্যহত করবে। নারী শিক্ষায় অব্যাহত বিনিয়োগের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আসতে পারে, যার ফলে তাঁরা অভিজ্ঞ ধাত্রীর মাধ্যমে সেবাকেন্দ্রে প্রসব করতে, এবং গর্ভ-সংক্রান্ত জটিলতার ক্ষেত্রে দ্রুত সেবা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেবা নেওয়ার হার বাড়ার ফলে এসব উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়, সেহেতু উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে সেবার দিকে আকৃষ্ট করা এবং সঠিক চিকিৎসার জন্য সেবাকেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা ক্রমান্বয়ে আরো বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। রক্তক্ষরণের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রসবের পূর্বে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে মিসোপ্রোস্টল ট্যাবলেট বিতরণ, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না তা বোঝার জন্য প্রসব সহকারীদের দ্বারা প্রসব ম্যাটের ব্যবহার, সেবাকেন্দ্রে উন্নত সেবা এবং রক্ত সঞ্চালন সুবিধা প্রসারিত করা এবং প্রসবের সময় একলামশিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের সহজলভ্যতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কিছু সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বিস্তৃত করা যেতে পারে।

References

1. National Institute of Population Research and Training. Bangladesh maternal health services and maternal mortality survey 2001. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2003.
2. Streatfield PK, Arifeen SE, Al-Sabir A, Jamil K. Bangladesh maternal mortality and health care survey 2010: Summary of key findings and implications. Dhaka: National Institute of Population Research and Training, 2011.

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অল্প-বয়সী শিশুদের মধ্যে এইচ৫এন১ এবং এইচ৯এন২ সংক্রমণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের মৃদু সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব

বাংলাদেশে ২০১১ সালের মার্চ মাসে একটি জনসংখ্যাভিত্তিক নগর-সার্ভিলেন্স ব্যবস্থা থেকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন১)-আক্রান্ত দুজন এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৯এন২)-আক্রান্ত একজন রোগী সনাক্ত করা হয়। রোগতত্ত্ববিদ, পশুরোগবিদ এবং নৃবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অনুসন্ধানী দল প্রাদুর্ভাবটি অনুসন্ধান করেন। তিনজন রোগীর সবাই ছিলো পাঁচ বছরের কম-বয়সী এবং তাদের জ্বরের সাথে কাশি এবং/অথবা নাক দিয়ে পানি ঝরা ছিলো। তাদের সবাই হাসপাতালে ভর্তি না হয়েই এবং রোগ পরবর্তী কোনো উপসর্গ ছাড়াই সুস্থ হয়ে ওঠে। সনাক্তকৃত উভয় এইচ৫এন১ ভাইরাস ক্লেড ২.২-এর অন্তর্ভুক্ত এবং বাংলাদেশে হাঁস-মুরগীর মধ্যে বিরাজ-মান ভাইরাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এইচ৯এন২ ভাইরাসটি এইচ৯ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের অন্তর্গত জি১ লিনেজ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী সনাক্তকরণ মানবদেহে নতুন কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা গোত্রের দ্বারা সংক্রমণের বিদ্যমান ঝুঁকির বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছে।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন১) ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী সনাক্ত করা হয় হংকং-এ ১৯৯৭ সালের মে মাসে (১)। তখন থেকে এ-পর্যন্ত ১৫টি দেশ থেকে ৫৫৩ জন ব্যক্তির নিশ্চিতভাবে এইচ৫এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (ডাব্লিউএইচও) জানানো হয় (২)। এশিয়া মহাদেশে ১৯৯৮ সাল থেকে এভিয়ান এইচ৯এন২ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসও মানুষের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে (৩-৫)। বাংলাদেশে এইচ৫এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম হাঁস-মুরগীর খামারটির খবর পাওয়া যায় ২০০৭ সালের মার্চ মাসে (৬) (চিত্র ১)। তারপর থেকে ০৯ মে ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশে এইচ৫এন১ ভাইরাসের মোট ৫১৯টি প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায় (৭) (চিত্র ১)। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে প্রথম নিশ্চিতভাবে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত করা হয় ২০০৮ সালে ঢাকার কমলাপুরের নগর-সার্ভিলেন্স প্রকল্প থেকে, যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জার ওপর একটি নিবিড় সক্রিয় সার্ভিলেন্স পরিচালিত হচ্ছে (৮)।

১৩ মার্চ ২০১১ তারিখে কমলাপুর নগর-সার্ভিলেন্স এলাকা থেকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসে (এইচ৫এন১) একজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে। পরবর্তী ১০ দিনে একই সার্ভিলেন্স এলাকায় আরো দুজন এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় বলে খবর পাওয়া যায় – একজন এইচ৫এন১ এবং অন্যজন এইচ৯এন২ ভাইরাসে।

প্রথম আক্রান্ত রোগীর খবর পাওয়া মাত্র প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানের জন্য রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) যৌথভাবে রোগতত্ত্ববিদ, পশুরোগবিদ এবং নৃবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে। এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসের সংক্রমণের পথ এবং যেসব উপাদান এই তিনজন মানুষের দেহে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণে ভুমিকা রেখেছে তার অনুসন্ধান করা। এই প্রতিবেদনে আমরা এই রোগীদের রোগতাত্ত্বিক, ক্লিনিক্যাল এবং ভাইরোলোজিক্যাল তথ্য তুলে ধরেছি।

চিত্র ১: বাংলাদেশের মানচিত্রে উচ্চমাত্রায় রোগসৃষ্টিতে সক্ষম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার (এইচপিএআই) প্রাদুর্ভাবকবলিত হাঁস-মুরগীর খামার, মার্চ ২০০৭ থেকে মে ২০১১

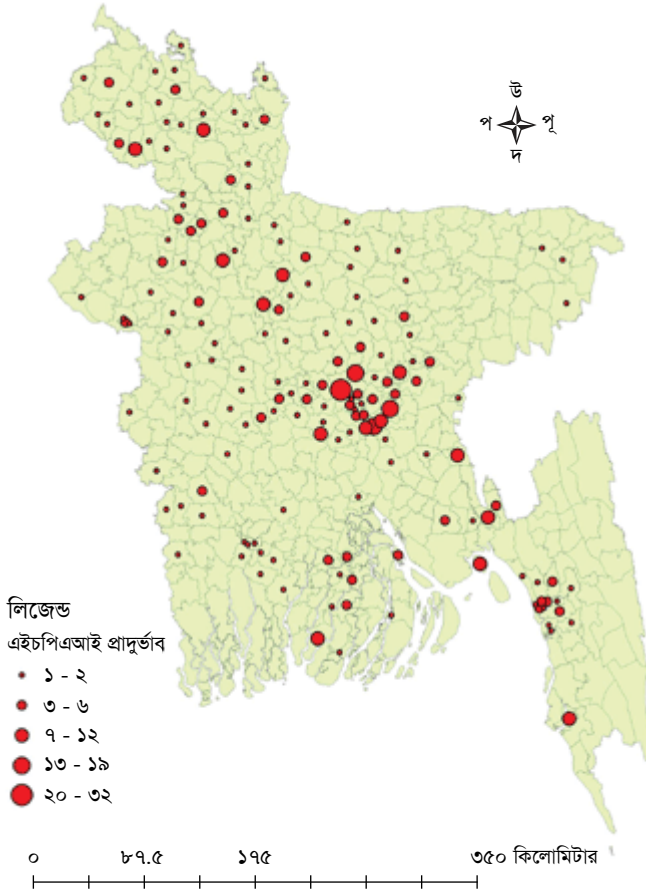

Source: http://www.aitubd.org/inner.php?Page=5

আমরা আক্রান্ত রোগীদের সম্পর্কে কমলাপুর সার্ভিলেন্স কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য পর্যালোচনা করেছি। যেহেতু সব রোগীর বয়সই ছিলো পাঁচ বছরের কম, সেহেতু একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করে রোগীদের মাতা-পিতার নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার ১৫ দিন পূর্ব থেকে রোগীদের ক্লিনিক্যাল, রোগতাত্ত্বিক এবং সংক্রমণের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করি। মাতা-পিতার কাছ থেকে সংক্রমণের সম্ভাব্য উৎসের ইতিহাস এবং পরিবেশগত উৎস সম্পর্কে আরো ভালোভাবে অবগত হওয়ার জন্য আমরা রোগীদের খানা পরিদর্শন করি। আমরা বারংবার রোগীদের নাক ধোয়া পানি সংগ্রহ করি (চিত্র ২)। প্রত্যেক রোগীর মাতা-পিতা এবং রোগী 'এ'-এর অন্য দুজন সেবাদানকারীর কাছ থেকে নাক ধোয়া পানি বা নাকের সোয়াবের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করি। নমুনাগুলো থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্ত করার জন্য আইইডিসিআর

এবং আইসিডিডিআর,বির ল্যাবরেটরিতে রিয়াল টাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ পলিমিরেজ চেইন রিয়াকশন (আরটি-পিসিআর)-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। ভাইরাসসমূহ পুনঃবিশ্লেষণের জন্য আমরা নমুনাগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর ল্যাবরেটরিতেও পাঠাই। কমলাপুরের এই তিনজন রোগীর বাড়ির কাছে অবস্থিত তাজা মুরগীর দুটি বাজার থেকে আমরা মুরগীর বিষ্ঠার নমুনা সংগ্রহ করি।

রোগী 'এ' ছিলো ১৩ মাস-বয়সী একটি মেয়ে, যে মার্চ মাসের ৫ তারিখে কাশিতে আক্রান্ত হয় এবং এরপর ৭ মার্চে তার জ্বর আসে। সে ৯ মার্চ আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর ক্লিনিকে আসে। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তখন তার শরীরে জ্বর ছিলো ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তবে অন্য সব পরীক্ষার ফলাফল ছিলো স্বাভাবিক (সারণি ১)। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী হিসেবে সনাক্ত করেন এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সের চলতি কাজের অংশ হিসেবে তার কাছ থেকে নাক ধোয়া পানির নমুনা সংগ্রহ করেন। মার্চের ১৩ তারিখে রিয়াল টাইম আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫) ভাইরাস সনাক্ত করা হয়, এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধিমালা অনুযায়ী আইইডিসিআর তাৎক্ষণিকভাবে তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে জানায়। মার্চের ১৪ তারিখে আমরা যখন রোগীর অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি, তখন তাঁরা জানায় যে, ১১ মার্চ থেকে রোগীর জ্বর নেই, তবে কাশি ছিলো এবং ওইদিন একবার পাতলা পায়খানাও হয়েছিলো (চিত্র ২)।

সারণি ১: বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ৫এন১ এবং এইচ৯এন২ সংক্রমণের ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্যসমূহ, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১১

রোগী	বয়স (মাস)	লিঙ্গ	অসুস্থতা শুরুর তারিখ	লক্ষণসমূহ	তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)	লক্ষণসমূহের স্থায়ীত্বকাল	নাক ধোয়া পানি সংগ্রহের তারিখ	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ সাবটাইপ
এ	১৩	মহিলা	০৫ মার্চ ২০১১	জ্বর, কাশি ও ডায়রিয়া	৩৯°	২২ দিন	৯ মার্চ ২০১১	এইচ৫এন১
বি	৩১	পুরুষ	০১ মার্চ ২০১১	জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি ঝরা, চোখ ওঠা, বমি করা এবং ডায়রিয়া	৩৮.৮°	১২ দিন	৭ মার্চ ২০১১	এইচ৫এন১
সি	৫১	মহিলা	২৫ ফেব্রু ২০১১	জ্বর, মাথাব্যথা, নাক দিয়ে পানি ঝরা, কাশি এবং হাঁচি	৩৮.২°	৩ দিন	২৬ ফেব্রু ২০১১	এইচ৯এন২

সে অসুস্থ হওয়ার সাতদিন পূর্বে তাদের বাড়িতে তার উপস্থিতিতে সাতটি মুরগী জবাই করে সেগুলোর পাখনা তোলা এবং চামড়া ছাড়ানো হয়। রোগী 'এ' অসুস্থ হওয়ার পাঁচদিন পূর্বে তিনদিনের জন্য মুন্সিগঞ্জে তার দাদাবাড়ি বেড়াতে যায়। মুন্সিগঞ্জে থাকাকালীন সে তার মায়ের দাদীর সংস্পর্শে আসে যিনি শ্বাসনালির (ব্রঙ্কিয়াল) অ্যাজমা রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং সেই সময় শ্বাসতন্ত্রজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সে সময়ের সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে গ্রামে কাক মরে থাকার খবর পাওয়া যায় এবং অনুসন্ধানী দল একটি অসুস্থ কাক, পাঁচটি মৃত কাক এবং প্রতিবেশিদের পালিত মুরগী মুক্তভাবে বিচরণ করতে দেখেন।

রোগী 'বি' ছিলো ৩১ মাস-বয়সী একটি ছেলেশিশু, যার কাশি এবং নাক দিয়ে পানি ঝরা শুরু হয় ১ মার্চ তারিখে, ২ তারিখে দেখা দেয় চোখের প্রদাহ (কনজাংটিভাইটিস)। ৫ মার্চ শিশুটি জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং ৬ মার্চ তার একবার বমি ও পাতলা পায়খানা হয় (সারণি ১)। ৭ মার্চ আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর ক্লিনিকের চিকিৎসকেরা শিশুটির টনসিল ফোলা দেখতে পান এবং রোগীর লক্ষণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতার সাথে মিলে যাওয়ার ফলে তাঁরা শিশুটির নাক ধোয়া পানির নমুনা সংগ্রহ করেন। চিকিৎসকেরা তাকে অ্যামোক্সিসিলিন ও ক্লাভুলানিক এসিড সিরাপ দিয়ে চিকিৎসা করেন। ১৫ মার্চ শিশুর নাক ধোয়া পানির নমুনা থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫) ভাইরাস সনাক্ত করা হয় (চিত্র ২)।

রোগী 'বি' অসুস্থ হওয়ার ১০ বা ১২ দিন পূর্বে একটি জীবিত মুরগী স্পর্শ করেছিলো যখন তার মা ভ্রাম্যমান একজন মুরগী বিক্রেতার কাছ থেকে একটি মুরগী কিনেছিলেন। জবাই করার পর মুরগীটির নাড়ীভুড়ি বের করার সময় শিশুটি সেখানে উপস্থিত ছিলো। এরপর যখন তিনি রান্নার জন্য মুরগীটি প্রস্তুত করছিলেন তখন একটি ছুরিতে শিশুটির হাত কেটে যায়। এ-অবস্থায় রক্ত বন্ধ করার জন্য তিনি মুরগীর রক্ত মাখা হাত দিয়েই শিশুটির কাটা জায়গায় চেপে ধরেন। তাঁরা যে বস্তিতে বসবাস করেন সেখানে তাঁদের প্রতিবেশিদের অনেকেই শিশুটি যে আঙ্গিনায় খেলাধুলা করতো সেখানে হাঁস-মুরগী এবং কোয়েল পালন করতো। শিশুটির মা শিশুটি অসুস্থ হওয়ার পূর্বের সপ্তাহে তাকে নিয়ে মুরগী বিক্রি হয় এমন একটি কাঁচা বাজারের ভিতরে গিয়েছিলেন।

রোগী 'সি' ৫১ মাস-বয়সী একজন মেয়ে শিশু, ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখে যার জ্বর এবং মাথা ব্যথা ছিলো। পরের দিন তার নাক দিয়ে পানি ঝরতে থাকে, এবং কাশি ও হাঁচিতে আক্রান্ত হয় এবং সেদিনই তার মা তাকে আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর ক্লিনিকে নিয়ে যান। ক্লিনিকের কর্মচারিরা তার জ্বর মেপে দেখেন তার শরীরের তাপমাত্রা তখন ৩৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিলো (সারণি ১)। তখন তাঁরা তার নাক ধোয়া পানির নমুনা সংগ্রহ করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্যারাসিটামল এবং খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। আইসিডিডিআর,বির ভাইরোলোজিস্টরা আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তার নাক ধোয়া পানির নমুনা থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (আনটাইপেবল) ভাইরাস সনাক্ত করেন এবং পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য নমুনাটি সিডিসি-আটলান্টায় পাঠান। ২৩ মার্চ সিডিসি-আটলান্টায় আংশিক সিকোয়েন্সিং করে নমুনাটি থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৯এন২) ভাইরাস সনাক্ত করা হয় (চিত্র ২)।

রোগী 'সি'-এর মাতা-পিতার কাছ থেকে জানা যায় যে, সে সব সময় মুরগীর মাংস কেটে টুকরা করা এবং ধোয়ার কাজে অংশগ্রহণ করতো। সে অসুস্থ হওয়ার পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তার বাবা চারবার পালক ছাড়ানো এবং নাড়ীভুড়িমুক্ত মুরগী কিনে আনেন। সে অসুস্থ হওয়ার আনুমানিক পাঁচদিন পূর্বে তার মা তাদের বারান্দায় একটি মৃত চড়ুই দেখতে পান। মা তার শিশুকে তখন মৃত চড়ুইটি দেখার জন্য ডাকেন, তবে তিনি মনে করতে পারেন নি যে, শিশুটি মৃত চড়ুইটি ধরেছিলো কি না। এই তিনজন রোগীর কারোরই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় নি এবং তাদের সবাই আর কোনো সমস্যা ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। রিয়াল টাইম আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে রোগীদের পরিবারের সবার নাক ধোয়া পানি এবং নাকের সোয়াব পরীক্ষা করে কারোর মধ্যেই ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস সনাক্ত করা যায় নি।

তিনজন রোগীর সবার নাক ধোয়া পানির নমুনা থেকেই ভাইরাস সনাক্ত করা হয় এবং পরীক্ষাকৃত আইসোলেটের পরিপূর্ণ জেনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। সনাক্তকৃত দুটি এইচ৫এন১ ভাইরাসের

চিত্র ২: বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১ এবং এইচ৯এন২ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের সময়-ক্রম, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১১

এনপিডব্লিউ: নসোফেরিঞ্জাল ওয়াস

ফাইলোজেনেটিক বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, সেগুলো ক্লেড ২.২ লিনেজ-এর অন্তর্গত এবং বাংলাদেশে সম্প্রতি সনাক্তকৃত এভিয়ান বংশোদ্ভুত এইচ৫এন১ ভাইরাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। এইচ৯এন২ ভাইরাসটি এইচ৯ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের অন্তর্গত জি১ লিনেজ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তিনটি নিউরামিনিডেজ ইনহিবিটর (অসেলটামিভির, জানামিভির এবং পেরামিভির)-এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিভাইরাল সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ভাইরাসসমূহ সবগুলো ওষুধের প্রতি সংবেদনশীল ছিলো।

কমলাপুরের এই তিনজন রোগীর বাড়ির কাছের দুটি হাঁস-মুরগীর বাজার থেকে সংগৃহীত হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠার নমুনা সংগ্রহ করে আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে সেগুলোতে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫) ভাইরাস সনাক্ত করা হয়।

প্রতিবেদন: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; প্রোগাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি।

অর্থানুকূল্য: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

মন্তব্য

এটি ছিলো বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের একটি প্রাদুর্ভাব, যেখানে ফেব্রুয়ারির শেষ এবং মার্চের প্রারম্ভের এই দু সপ্তাহের মধ্যে রোগতাত্ত্বিকভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কহীন তিনজন রোগী সনাক্ত করা হয়। এদের দুজন ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের এইচ৫এন১-এ এবং একজন এইচ৯এন২-এ আক্রান্ত ছিলো। রোগের মৃদু লক্ষণসহ সব কজন রোগীই ছিলো শিশু এবং তাদেরকে ঢাকার কমলাপুরে জনসংখ্যাভিত্তিক একটি চলমান নিবিড় ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স এলাকা থেকে সনাক্ত করা হয়।

১ জানুয়ারি ২০১০ থেকে ৩১ মার্চ ২০১১ সময়ের মধ্যে কমলাপুরে জনসংখ্যাভিত্তিক এই নগর-সার্ভিলেন্সের আওতাভুক্ত ৬,৬০০টি খানা থেকে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা জ্বর এবং/অথবা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে আক্রান্ত ছিলো, তাদের কাছ থেকে ৬,০০০-এর ও বেশি নাক ধোয়া পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত সনাক্তকৃত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার চারজন রোগীর সবাইকেই সনাক্ত করা হয় শহুরে এই এলাকা থেকে, যা অভিনব কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্তকরণে জনসংখ্যাভিত্তিক নিবিড় সার্ভিলেন্সের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। এই সার্ভিলেন্স প্লাটফরম ইনফ্লুয়েঞ্জার জাতীয় সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স সিস্টেমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে, যেখানে হাসপাতালসমূহে আরো অধিকতর অসুস্থ রোগীর কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

এই প্রাদুর্ভাবের সময় এবং এর আগে বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার উপস্থিতি ছিলো (৭,৯)। এই নিবন্ধে আলোচিত রোগীদের সবার তাদের রোগ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী ১৫ দিন সময়ের মধ্যে হাঁস-মুরগীর সংস্পর্শে থাকার ইতিহাস ছিলো (চিত্র ২)। মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১ সংক্রমণের সুপ্তিকাল দু থেকে আটদিন এবং সর্বোচ্চ সম্ভবত ১৭ দিন (১০)। সুতরাং একথা বলা যায় যে, এই শিশুদের অসুস্থতার সম্ভাব্য উৎস ছিলো হাঁস-মুরগীর সাথে সংস্পর্শ।

মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচ৫এন১) ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যুহার অনেক বেশি

(৫৮%), তবে মৃদু লক্ষণসম্বলিত রোগীও পাওয়া গেছে (১,১১)। বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন১) ভাইরাস দ্বারা এ-পর্যন্ত আক্রান্ত তিনজন রোগীর সবাই ছিলো শিশু এবং তাদের কোনো মারাত্মক অসুস্থতা ছিলো না। হাঁস-মুরগীর সাথে শিশুদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বাংলাদেশে একটি সাধারণ ব্যাপার। সুতরাং নিবিড় সার্ভিলেন্স চালু থাকা এই একটি এলাকার শিশুদের মধ্য থেকে বারবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সনাক্ত করা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের আরো অনেক স্থানে মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ থাকতে পারে, যদিও আমরা হাসপাতালভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স থেকে মারাত্মক কোনো রোগী সনাক্ত করতে পারি নি। মৃদু লক্ষণে আক্রান্ত রোগীদেরকে পরীক্ষা করার সম্ভাবনা যেহেতু কম এবং এ-ধরনের রোগীদের খবর সাধারণত কম আসে, তাই মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৫এন১) দ্বারা আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুহারের বিদ্যমান হিসাব রোগের তীব্রতাকে অতিরঞ্জিত করে থাকতে পারে।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচ৯এন২) রোগসৃষ্টিতে কম শক্তিশালী একটি ভাইরাস যা এশিয়া মহাদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত (১২)। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের তাজা হাঁস-মুরগীর বাজারে এইচ৯এন২ বিরাজমান (৯)। বিক্ষিপ্তভাবে (স্পোরেডিক) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ৯এন২) সংক্রমণে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে সাধারণত মৃদু লক্ষণ দেখা যায় (৩,৪)। যেহেতু এইচ৯এন২ ভাইরাসটি উচ্চমাত্রায় জীনগত নমনীয় একটি অভিনব (নোভেল) প্রজাতি (স্ট্রেইন), যার মধ্যে ব্যাপক বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে ও যার জীনের পুনঃসন্নিবেশ (রিঅ্যাসোর্টমেন্ট)-এর প্রবণতা রয়েছে এবং ইতোমধ্যেই মানবদেহে সংক্রমণ ও রোগ সৃষ্টিতে সক্ষমতা দেখিয়েছে, সেহেতু এটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক মহামারীর কারণ হতে পারে বলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে। তাই প্রতিবার মানুষের মধ্যে এইচ৯এন২ ভাইরাসের সংক্রমণ মানুষের মধ্যে বিরাজমান অন্যান্য ভাইরাসের সাথে পুনঃসন্নিবেশের সুযোগ তৈরি করে এবং মহামারী সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রজাতি জন্ম নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। অতএব, রোগ সৃষ্টিতে কম শক্তিশালী এই এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার জন্য গবেষণা করা উচিত।

বাংলাদেশে মানবদেহে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ এবং হাঁস-মুরগীর খামারে এইচ৫এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব বর্তমান থাকায় মানুষের মধ্যে মৃদু এবং তীব্র উভয় মাত্রার শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিষয়টি মাথায় রেখে চিকিৎসকদের উচিত অসুস্থ অথবা মৃত পাখির সাথে রোগীদের সম্ভাব্য সংস্পর্শ খুঁজে দেখা এবং একই স্থানে একসঙ্গে অনেকের (গুচ্ছ) শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পেলে তা সরকারি কর্তৃপক্ষকে জানানো।

References

1. Chan PK, 2002. Outbreak of avian influenza A (H5N1) virus infection in Hong Kong in 1997. *Clin Infect Dis* 2002;34(Suppl 2):S58-64.
2. World Health Organization. Influenza at the human-animal interface. (http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/Influenza_Summary_IRA_HA_interface.pdf, accessed on 19 May, 2011).
3. Peiris M, Yuen KY, Leung CW, Chan KH, Ip PL, Lai RW *et al*. Human infection with influenza H9N2. *Lancet* 1999;354: 916-7.

4. Butt KM, Smith GJ, Chen H, Zhang LJ, Leung YH, Xu KM *et al*. Human infection with an avian H9N2 influenza A virus in Hong Kong in 2003. *J Clin Microbiol* 2005;43: 5760-7.
5. Uyeki TM, Chong YH, Katz JM, Lim W, Ho YY, Wang SS *et al*. Lack of evidence for human-to-human transmission of avian influenza A (H9N2) viruses in Hong Kong, China 1999. *Emerg Infect Dis* 2002;8:154-9.
6. Biswas PK, Christensen JP, Ahmed SS, Barua H, Das A, Rahman MH *et al*. Avian influenza outbreaks in chickens, Bangladesh. *Emerg Infect Dis* 2008;14(12):1909-12.
7. Food and Agriculture Organization. HAPI INFO. (http://www.aitubd.org/inner.php?Page=5, accessed on 15 May 2011).
8. Brooks WA, Alamgir AS, Sultana R, Islam MS, Rahman M, Fry AM *et al*. Avian influenza virus A (H5N1), detected through routine surveillance, in child, Bangladesh. *Emerg Infect Dis* 2009;15:1311-3.
9. Negovetich NJ, Feeroz MM, Jones-Engel L, Walker D, Alam SM, Hasan K *et al*. Live bird markets of Bangladesh: H9N2 viruses and the near absence of highly pathogenic H5N1 influenza. *PLoS One* 2011;6:e19311.
10. World Health Organization. Avian influenza: fact sheet. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/, accessed on 27 April 2011).
11. Kandun IN, Wibisono H, Sedyaningsih ER, Yusharmen, Hadisoedarsuno W, Purba W *et al*. Three Indonesian clusters of H5N1 virus infection in 2005. *N Engl J Med* 2006;355:2186-94.
12. Hossain MJ, Hickman D, Perez DR. Evidence of expanded host range and mammalian-associated genetic changes in a duck H9N2 influenza virus following adaptation in quail and chickens. *PLoS One* 2008;3:e3170.

লালমনিরহাট জেলায় নিপাহ এনসেফালাইটিসের প্রাদুর্ভাব, ২০১১

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় এনসেফালাইটিসের একটি প্রাদুর্ভাবের অনুসন্ধান করি। ২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উপজেলার ২০ জন অধিবাসী জ্বর এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তনজনিত অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের সবাই মারা যায়। আমরা নয়জন রোগীর কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এনজাইমলিংকড ইম্মিউনোসরবেন্ট অ্যাসে সম্পাদন করি। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের আটজনের রক্তে নিপাহ ভাইরাসের বিরুদ্ধে আইজিএম অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। স্বল্প সময়ের মধ্যে সব রোগীদের অসুস্থতা শুরু হওয়া এবং ৬৫% রোগীর ক্ষেত্রে কাঁচা খেজুর রস পান করার তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, এই প্রাদুর্ভাবের রোগীদের নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য উৎস হচ্ছে কাঁচা খেজুর রস। বাংলাদেশ সরকার এবারই প্রথম নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কাঁচা খেজুর রস পান করা থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণকে সুনির্দিষ্টভাবে পরামর্শ দিয়েছে। রোগীদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে উচ্চতর (টারশিয়ারি) হাসপাতালে এনসেফালাইটিস রোগীদের ভর্তি করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছা এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনীহার কথা জানা যায়। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিরাপত্তা ও রোগীদেরকে প্রদত্ত সেবার মান নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সংক্রমণ প্রতিরোধক উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

নিপাহ ভাইরাস একটি প্যারামিক্সোভাইরাস যা মানুষের মধ্যে প্রাণঘাতী এনসেফালাইটিসের সংক্রমণ ঘটায় (১)। টেরোপাস গোত্রীয় ফলখেকো বাদুড় দৃশ্যত নিপাহ ভাইরাসের প্রাকৃতিক বাহক এবং এদের লালা ও মূত্রের মাধ্যমে নিপাহ ভাইরাস নির্গত হতে পারে (২)। বাদুড় ঘন ঘন খেজুর গাছে যায়, রসের নালা চাটে এবং এদের লালা এবং/অথবা মূত্র তখন রসের সাথে মিশে রস নিপাহ ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে (৩)। ইতোপূর্বেকার প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানে কাঁচা খেজুর রসকে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (২)। নিপাহ ভাইরাস ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতেও সংক্রামিত হয় (২,৪)। ২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশে নিপাহ এনসেফালাইটিসের নয়টি প্রাদুর্ভাব সনাক্ত করা হয় (৫)। প্রাদুর্ভাবসমূহ থেকে সনাক্তকৃত এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে আক্রান্ত মোট ১৫৩ জন রোগীর মধ্যে ১১১ জন (৭৩%) মারা যায়।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিপাহ সার্ভিলেন্স কেন্দ্রে কর্তব্যরত চিকিৎসকের কাছ থেকে জানা যায় যে, লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলা থেকে সহোদর দুই ভাইবোন এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। পরের দিন সার্ভিলেন্স চিকিৎসক, লালমনিরহাটের সিভিল সার্জন এবং একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে তিনজন এনসেফালাইটিস রোগীর মৃত্যুর খবর এবং একই উপসর্গ নিয়ে একই উপজেলা থেকে আরো রোগীর হাসপাতালে ভর্তির খবর জানা যায়। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) থেকে রোগতত্ত্ববিদ, পশুরোগবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ অনুসন্ধানী দল একই দিনে প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান শুরু করেন। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিলো প্রাদুর্ভাবের কারণ এবং অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিসমূহ খুঁজে বের করা। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য আমরা এখানে তুলে ধরছি।

প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই আমরা স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠক করি এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বা কমিউনিটিতে অবস্থানরত জীবিত এবং মৃত রোগীসহ এনসেফালাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা সংগ্রহ করি। অনুসন্ধানের প্রাথমিক তথ্য এবং নিপাহ এনসেফালাইটিসের প্রাদুর্ভাবসম্পর্কিত আমাদের ইতোপূর্বেকার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আমরা তাদেরকে সন্দেহজনক নিপাহ এনসেফালাইটিসের রোগী হিসেবে সনাক্ত করি যারা হাতীবান্ধা উপজেলার অধিবাসী এবং ১ জানুয়ারি ২০১১ থেকে অনুসন্ধান চলাকালীন সময় পর্যন্ত জ্বর এবং নতুন করে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন বা শ্বাসতন্ত্রজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছিলো বা মারা গিয়েছিলো (৬)। আমরা চিকিৎসক, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী, স্থানীয় সাংবাদিক, এবং রোগীদের পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশিদের সাথে দলগত আলোচনা এবং কাঠামোবিহীন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন থাকা এবং প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকা থেকে সন্দেহজনক রোগী সনাক্ত করি। আমরা একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা ব্যবহার করে সন্দেহজনক রোগীদের জনমিতিক, ক্লিনিক্যাল এবং সংস্পর্শ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করি।

সন্দেহজনক জীবিত রোগীদের কাছ থেকে আমরা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করি। নমুনাগুলো সেন্ট্রিফিউজ করা হয় এবং এলিকোট করে তরল নাইট্রোজেনে আইইডিসিআর-এর ভাইরোলোজি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। এখানে এনজাইম-লিংকড ইম্মিউনোসরবেন্ট অ্যাসে দ্বারা নমুনাগুলোর নিপাহ আইজি এম অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা হয়। যেসব সন্দেহজনক রোগীর রক্তের নমুনায় নিপাহ আইজিএম অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় তাদেরকে নিশ্চিত রোগী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। রক্তের নমুনা সংগ্রহের পূর্বে মারা যাওয়া সন্দেহজনক রোগী অথবা যেসব রোগীর কাছ থেকে শুধুমাত্র তাদের রোগ শুরু হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে একবার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে নিপাহ আইজিএম অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় নি, তাদেরকে সম্ভাব্য নিপাহ রোগী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

রোগীদের রোগের সংস্পর্শে আসা ও অসুস্থ হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে জানা এবং রোগ সম্পর্কে এলাকার মানুষের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য নৃতত্ত্ববিদগণ প্রত্যেক নিশ্চিত এবং সম্ভাব্য রোগীর পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন এবং তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। আমরা প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকার কাঁচা খেজুর রস সংগ্রহ ও বিতরণকারী গাছিদেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা স্থানীয় জনসাধারণের সাথে দলগত সভা করেছি এবং বিগত নিপাহ গবেষণায় প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরি অসুস্থতার কারণ, রোগের লক্ষণ, সংক্রমণের পথ এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মানানসই তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করেছি।

হাতীবান্ধায় আমরা ২০ জন নিপাহ এনসেফালাইটিস রোগী সনাক্ত করেছি। যে নয়জনের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়, তাদের আটজন নিশ্চিত নিপাহ আইজিএম অ্যান্টিবডির বাহক ছিলো। অন্যরা সবাই ছিলো সন্দেহজনক রোগী। রোগীদের গড় বয়স ছিলো ১৮ বছর (রেঞ্জ: ২-৫৫ বছর); ১৭ জন (৮৫%) ছিলো পুরুষ। ২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের মধ্যে রোগীদের অসুস্থতা শুরু হয় (চিত্র ১)। রোগীরা হাতীবান্ধা উপজেলার পাঁচটি সন্নিহিত গ্রামের অধিবাসী ছিলো। বিশ জন রোগীর মধ্যে ১৯ জনের (৯৫%) অসুস্থতা শুরু হয় জ্বর দিয়ে; অন্য একজন রোগীর প্রথম উপসর্গ ছিলো মাথাব্যথা। পরিশেষে সব রোগীর মধ্যেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন এবং অচেতনতা দেখা দেয়। চৌদ্দজন (৭০%) রোগীর মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় যা শুরু হয় তাদের মারা যাওয়ার

দিনে অথবা মারা যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। রোগীদের সবাই মারা যায়। অসুস্থতা শুরু হওয়ার পর থেকে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত রোগীদের গড় অসুস্থতার মেয়াদ ছিলো পাঁচদিন (রেঞ্জ: ১-২২ দিন) (সারণি ১)। বিশজনের মধ্যে ১৩ জন (৬৫%) রোগী তাদের অসুস্থতা শুরুর পূর্বের ৩০ দিনের মধ্যে কাঁচা খেজুর রস পান করেছিলো।

চিত্র ১: রোগ শুরুর তারিখ অনুযায়ী হাতিবান্ধায় নিপাহ রোগীর বিন্যাস, জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ২০১১

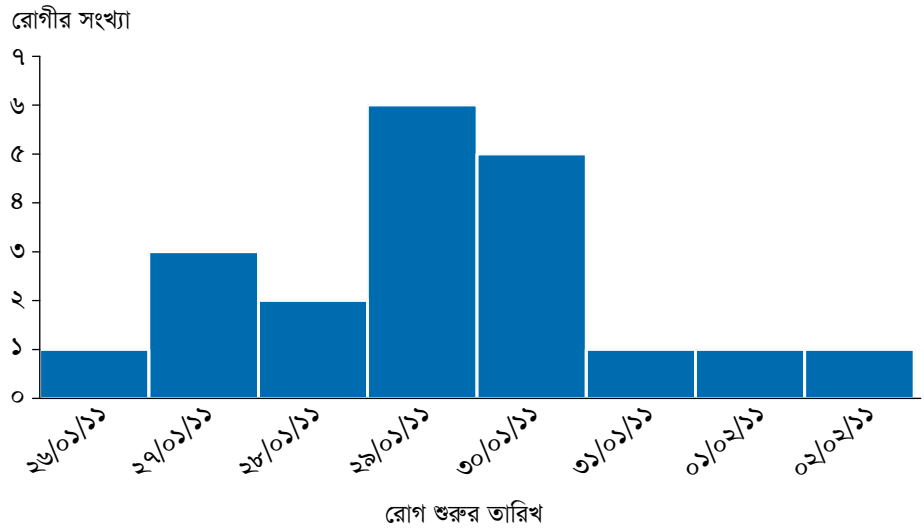

সারণি ১: বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় নিপাহ এনসেফালাইটিস রোগীদের ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্যসমূহ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১১

ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্যসমূহ	সংখ্যা (%)
জ্বর	২০ (১০০)
মানসিক অবস্থার পরিবর্তন	২০ (১০০)
অচেতনতা	২০ (১০০)
মাথাব্যথা	১৭ (৮৫)
শ্বাস নিতে কষ্ট	১৪ (৭০)
কাশি	১৪ (৭০)
মারাত্মক দুর্বলতা	১৪ (৭০)
তন্দ্রাচ্ছন্নতা	১৪ (৭০)
বমি	১১ (৫৫)
খিঁচুনী	১০ (৫০)
মাংসপেশীতে ব্যথা	৭ (৩৫)
হাড়ের সংযোগ স্থলে ব্যথা	৫ (২৫)
ফলাফল - মৃত্যু	২০ (১০০)
রোগ শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মধ্যমা (মিডিয়ান) সময় - দিন (রেঞ্জ)	৫ (১-২২)

রোগীদের আত্মীয়দের কাছ থেকে এনসেফালাইটিস রোগী ভর্তি করার ক্ষেত্রে কিছু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছার কথা জানা যায়, বিশেষ করে সেসব রোগীর ক্ষেত্রে, যাদের কাঁচা খেজুর রস পান করার ইতিহাস ছিলো এবং যারা প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকা থেকে এসেছিলো। এছাড়া, হাসপাতালে ভর্তি এনসেফালাইটিস রোগীর সেবাদানে সেবা প্রদানকারীদের অনিচ্ছার কিছু ঘটনাও জানা যায়।

নয়টি নিপাহ-সংক্রান্ত তথ্য প্রচার সভার প্রত্যেকটিতে আনুমানিক ৫০০-২,০০০ স্থানীয় অধিবাসী অংশগ্রহণ করে। শ্বাসতন্ত্র থেকে নির্গত রসের সাথে সম্ভাব্য সংস্পর্শ কমিয়ে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমরা চারটি আচরণগত তথ্য সরবরাহ করি, যথা, খাওয়ার পূর্বে এবং রোগীকে পরিষ্কার করা ও তাকে খাওয়ানোর পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, রোগীর উচ্ছিষ্ট খাবার না খাওয়া, আলাদা বিছানায় অথবা রোগীর উল্টোদিকে ফিরে ঘুমানো, এবং সেবা দেওয়ার সময় রোগীর মুখ থেকে অন্তত একহাত দুরে থাকা। বাদুড়-হতে-মানুষের মধ্যে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমরা কাঁচা খেজুর রস পান না করার জন্য সুপারিশ করি। বাংলাদেশ সরকারও বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলে কাঁচা খেজুর রস পান না করার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেছে।

প্রতিরোধ-সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার পর দেখা গেছে যে, আক্রান্ত এলাকা এবং তার সন্নিহিত গ্রামের অধিবাসীরা কাঁচা খেজুর রস পান করা থেকে বিরত রয়েছে এবং রস বিক্রেতাদের তারা বাজার বা অন্য কোনো জনসমাগমে কাঁচা খেজুর রস বিক্রি করতে দেয় নি। গাছ-মালিকেরা রস সংগ্রহের জন্য গাছিদেরকে তাদের খেজুর গাছ চাঁছতে দেন নি। স্থানীয় অধিবাসীরা খেজুর রস সংগ্রহের মওসুম শুরু হওয়ার পূর্বে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কাঁচা খেজুর রস পান পরিহার করা-সংক্রান্ত তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার করে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করেছেন।

প্রতিবেদক: রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর; রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; প্রোগ্রাম অন ইনফেকশাস ডিজিজেজ অ্যান্ড ভ্যাকসিন সায়েন্সেস, আইসিডিডিআর,বি।

অর্থানুকূল্য: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং প্লান ইন্টারন্যাশলাল।

মন্তব্য

আলোচ্য প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানের পর প্রাপ্ত রোগতাত্ত্বিক, ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরির ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, এটি ছিলো নিপাহ এনসেফালাইটিসের একটি প্রাদুর্ভাব। স্বল্প সময়ের মধ্যে সব রোগীদের অসুস্থতা শুরু হওয়া এবং ৬৫% রোগীর ক্ষেত্রে কাঁচা খেজুর রস পান করার ইতিহাস থেকে বোঝা যায় যে, এই প্রাদুর্ভাবের রোগীদের নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য উৎস হচ্ছে কাঁচা খেজুর রস। এটি কাঁচা খেজুর রস পানের মাধ্যমে বাদুড়-থেকে-মানুষের মধ্যে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ-সংক্রান্ত আমাদের ইতোপূর্বেকার প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধানের ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (২)। বাংলাদেশে কাঁচা খেজুর রস একটি সুস্বাদু পানীয়, যা পান করা স্থানীয় সংস্কৃতির একটি অংশ, বিশেষ করে শীতকালে (৩)। নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কাঁচা খেজুর রস পান করা থেকে বিরত থাকার জন্য এবারই প্রথম বাংলাদেশ সরকার সুনির্দিষ্টভাবে জনগণকে

পরামর্শ দিয়েছে। ভবিষ্যতের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক বছর শীতকালে খেজুর রস সংগ্রহের মওসুম আসার আগে মানুষকে কাঁচা খেজুর রস পান করতে নিরুৎসাহিত করার জন্য ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার।

এই প্রাদুর্ভাবে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি, যদিও ইতোপূর্বেকার প্রাদুর্ভাবের মতো, যখন ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রমণ ঘটেছিলো, এবারও রোগীর পরিবারের সদস্য এবং সেবাদানকারীরা রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলো (৪,৭)। এবার রোগীদের মৃত্যুহারও (১০০%) ইতোপূর্বেকার প্রাদুর্ভাব থেকে বেশি (১,৪,৭)। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিপাহ প্রাদুর্ভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের থেকে সনাক্তকৃত নিপাহ ভাইরাসের মধ্যে যথেষ্ট জীনগত বৈচিত্র্য দেখা যায় (৮)। এবারের প্রাদুর্ভাবের উচ্চ মৃত্যুহার অধিকতর শক্তিশালী নিপাহ ভাইরাসের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে। অতএব এবারকার প্রাদুর্ভাব সংঘটনকারী নিপাহ ভাইরাসের সাথে পূর্বের প্রাদুর্ভাবসমূহে সনাক্তকৃত নিপাহ ভাইরাসের তুলনামূলক জীনগত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইতোপূর্বেকার নিপাহ প্রাদুর্ভাবে যেসব ক্ষেত্রে কাঁচা খেজুর রস পান করার বিষয়টি একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হিসেবে সনাক্ত করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে মৃত্যুহার ছিলো প্রধানত ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রামিত প্রাদুর্ভাবের রোগীদের মৃত্যুহারের তুলনায় বেশি। অতএব, খেজুরের রসে ভাইরাসের পরিমাণ বা রোগ সংক্রমণের পথও উচ্চ মৃত্যুহারের কারণের সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকতে পারে।

আমরা যেহেতু রোগীদের পক্ষে অন্য উত্তরদাতাদের কাছ থেকে রোগের সংস্পর্শে আসা সংক্রান্ত (এক্সপোজার) ইতিহাস সংগ্রহ করেছি, সেহেতু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে অসুস্থ হওয়ার পূর্বের ৩০ দিনে কাঁচা খেজুর রস পান করার তথ্যসহ, সম্ভাব্য সকল সংস্পর্শের কথা সনাক্ত নাও হয়ে থাকতে পারে।

এই রোগের উচ্চ মৃত্যুহার, সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার অভাব, ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রমণের ঘটনা এবং সম্প্রতি একজন চিকিৎসকের মধ্যে হাসপাতাল হতে সম্ভাব্য নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণের কারণে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীগণ সন্দেহজনক নিপাহ এনসেফালাইটিস রোগীদের সেবা প্রদানে অথবা তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে ভয় পেয়ে থাকতে পারেন (৫)। বাংলাদেশে সংঘটিত ইতোপূর্বেকার নিপাহ প্রাদুর্ভাবের সময়ও নিপাহ রোগীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের এ-ধরনের অনীহা পরিলক্ষিত হয়েছে (৯)। রোগীদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা স্বাস্থ্যকর্মীদের পেশাগত এবং নৈতিক দায়িত্ব। নিপাহ অথবা সম্ভাব্য অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদেরকে চিকিৎসাসেবা দিতে অস্বীকৃতি না জানিয়ে বরং সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি-সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাব্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় উচ্চমানসম্পন্ন সেবা দেওয়ার সময় সংক্রমণ প্রতিরোধের উপকরণের ব্যবহার বাড়ানো উচিত। এজন্য সবধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাঁদের ব্যক্তি-সুরক্ষা উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

References

1. Hsu VP, Hossain MJ, Parashar UD, Ali MM, Ksiazek TG, Kuzmin I, *et al*. Nipah virus encephalitis reemergence, Bangladesh. *Emerg Infect Dis* 2004;10:2082-7.
2. Luby SP, Gurley ES, Hossain MJ. Transmission of human infection with Nipah virus. *Clin Infect Dis* 2009;49:1743-8.

3. Khan MSU, Hossain MJ, Gurley ES, Nahar N, Sultana R, Luby SP. Use of Infrared Camera to Understand Bats' Access to Date Palm Sap: Implications for Preventing Nipah Virus Transmission. *EcoHealth* 2011;DOI: 10.1007/s10393-010-0366-2. [Epub ahead of print].
4. Gurley ES, Montgomery JM, Hossain MJ, Bell M, Azad AK, Islam MR, *et al*. Person-to-person transmission of Nipah virus in a Bangladeshi Community. *Emerg Infect Dis* 2007;13:1031-7.
5. ICDDR,B. Nipah Outbreak in Faridpur District, Bangladesh, 2010. *Health Sci Bul* 2010;8:6-11.
6. Hossain MJ, Gurley ES, Montgomery JM, Bell M, Carroll DS, Hsu VP, *et al*. Clinical presentation of Nipah Virus in Bangladesh. *Clin Infect Dis*, 2008;46:977-84.
7. Homaira N, Rahman M, Hossain MJ, Nahar N, Khan R, Rahman M, *et al*. Cluster of Nipah Virus Infection, Kushtia District, Bangladesh, 2007. *PLoS ONE* 5(10): e13570. doi:10.1371/journal.pone.0013570.
8. Harcourt BH, Lowe L, Tamin A, Liu X, Bankamp B, Bowden N, *et al*. Genetic characterization of Nipah virus, Bangladesh, 2004. *Emerg Infect Dis* 2005;11:1594-7.
9. Blum LS, Khan R, Nahar N, Breiman RF. In-depth assessment of an outbreak of Nipah encephalitis with person-to-person transmission in Bangladesh: Implications for prevention and control strategies. *Am J Trop Med Hyg*. 2009;80:96-102.

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাদাগকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়। আমরা আশা করছি, বাংলাদেশে রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদশীলতার অনুপাত: জুন ২০১০-মে ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=৭৫)	*ভি. কলেরি ও১* (সংখ্যা=২৮৩)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৬৩.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৭.৩	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	২৭.০	০.০৪
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৪৭.৩	৯৯.৩
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৫৫.১
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.৪
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	পরীক্ষা করা হয় নি

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: জুন ২০১০-মে ২০১০

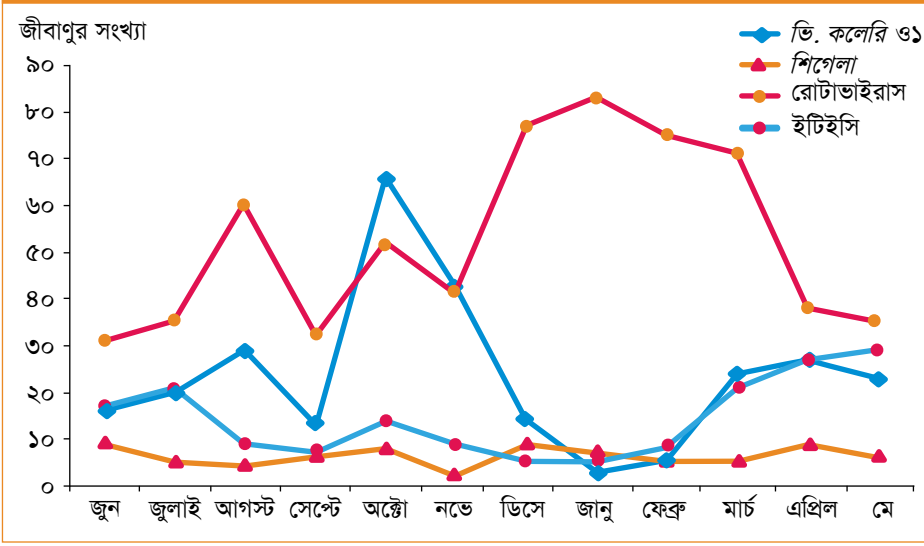

ওষুধের বিরুদ্ধে ১৩১ টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: মে ২০১০-এপ্রিল ২০১১

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট সংখ্যা=১৩১ (%)
	প্রাথমিক সংখ্যা=১১৯ (%)	একোয়ার্ড* সংখ্যা=১২ (%)	
স্ট্রেপটোমাইসিন	১৯ (১৬.০)	২ (১৬.৭)	২১ (১৬.০)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৩ (২.৫)	০ (০.০)	৩ (২.৩)
ইথামবিউটাল	১ (০.৮)	০ (০.০)	১ (০.৮)
রিফামপিসিন	৪ (৩.৪)	১ (৮.৩)	৫ (৩.৮)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৩ (২.৫)	০ (০.০)	৩ (২.৩)
অন্যান্য ওষুধ	২০ (১৬.৮)	২ (১৬.৭)	২২ (১৬.৮)

( ) শতকরা হার *একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১০	২ (২০.০)	০ (০.০)	৮ (৮০.০)
ক্লোরামফেনিকল	৪	৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিআক্সোন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	১১	২ (১৮.৮)	০ (০.০)	৯ (৮২.০)
অক্সাসিলিন	১১	১০ (৯১.০)	০ (০.০)	১ (৯.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: এপ্রিল-জুন ২০১১

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধী সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৪৪	২৮ (৬৪.০)	০ (০.০)	১৬ (৩৬.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৪৪	২৫ (৫৭.০)	০ (০.০)	১৯ (৪৩.০)
ক্লোরামফেনিকল	৪৪	২৫ (৫৭.০)	০ (০.০)	১৯ (৪৩.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৪৪	৪৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৪৪	২ (৪.০)	৪২ (৯৬.০)	০ (০.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৪৪	২ (৪.০)	০ (০.০)	৪২ (৯৬.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর (ঢাকা) সার্ভিলেন্স এলাকা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী এবং বহির্বিভাগে আগত ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের হার: জুলাই ২০০৮-মে ২০১১

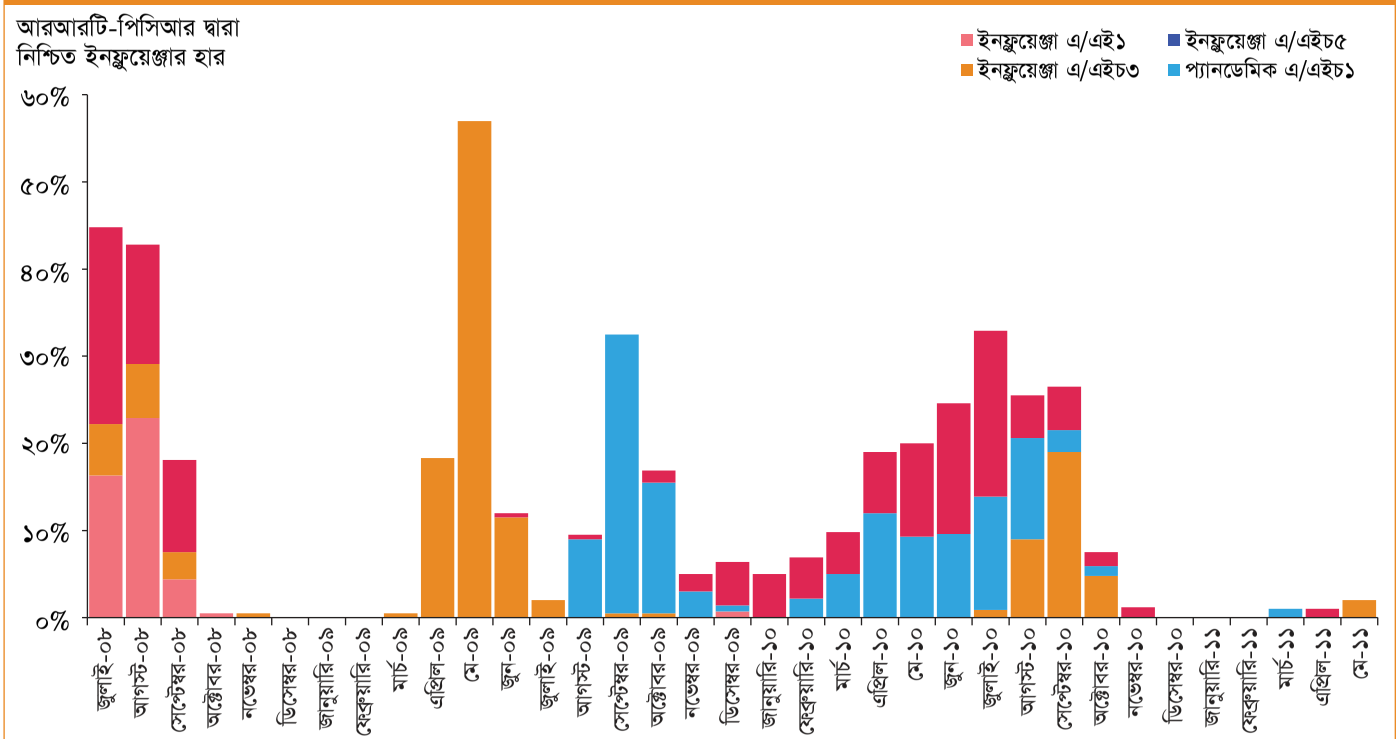

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ), জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া), ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর), বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম), কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর জেনারেল হাসপাতাল, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট) এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

একজন ভ্রাম্যমান মুরগী বিক্রেতা

আইসিডিডিআ,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকূল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি. লুবি
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
ডরথি সাউদার্ন

অতিথি সম্পাদক:
ড্যানিয়েল সেফনার
কামরুন নাহার

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
১ম নিবন্ধ:
শামস এল আরেফিন
পিটার কিম স্ট্রিটফিল্ড
২য় নিবন্ধ:
অপূর্ব চক্রবর্ত্তী
৩য় নিবন্ধ:
অপূর্ব চক্রবর্ত্তী

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অনুবাদ:
এম. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
মাহবুব-উল-আলম

ডিজাইন ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম

মুদ্রণে:
দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb